অধিকারবঞ্চিত রি-রোলিং স্টিল মিলসের শ্রমিক : করণীয় কী?

বাংলাদেশের শ্রমিকদের জীবনে প্রতারণা, বঞ্চনা ও নিরাপত্তাহীনতার শেষ নেই। এদের মধ্যে আবার অধিকতর নিরাপত্তাহীন বঞ্চিত শ্রমিকদের মধ্যে রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিকেরা অন্যতম। গত ৮ এপ্রিল ২০১৯ রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে ঢাকায় তাঁদের অধিকার ও লড়াই নিয়ে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধ এখানে প্রকাশ করা হল।

৬ কোটি ৩৫ লাখ শ্রমশক্তির বাংলাদেশে ৪৩টি সেক্টরে মজুরি বোর্ড আছে। রি-রোলিং স্টিল মিলস তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু বাংলাদেশে শ্রমিকদের সবচেয়ে কষ্টকর এবং সবচেয়ে অবহেলিত খাতের নাম রি-রোলিং মিলস। চার শতাধিক ছোটবড় রি-রোলিং ও স্টিল মিলের প্রায় ২ লাখ শ্রমিক কী কঠোর পরিশ্রম ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করে! বাংলাদেশের রডের চাহিদা গড়ে ৮০ লাখ টন। এর অধিকাংশই উৎপাদিত হয় দেশের রি-রোলিং সেক্টর থেকে। বলা হয়, দেশের যে কোন স্থাপনার মূলশক্তি হচ্ছে তার লোহা। আমাদের দেশে আকরিক বা স্ক্র্যাপ থেকে লোহার চাহিদা মেটানো হয়। লোহা দ্বারা প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরির জন্য লোহাকে গলিয়ে বিভিন্ন আকৃতি দিতে হয়। ১৫৩৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় লোহা গলানো হয়। ফলে যে ফার্নেসে লোহা গলানোর কাজ হয় তার বাইরে ৬০-৬৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপ থাকে। স্বাভাবিকভাবে আমরা দেখি যে, ৩৫-৩৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেখানে ৬০-৬৫ ডিগ্রি তাপমাত্রায় কী কঠিন পরিস্থিতি হয় তা অনুমান করাও কষ্টকর। একটু অসতর্ক হলেই উত্তপ্ত লোহার রড বা আগুন থেকে ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে। কত শ্রমিকের শরীর এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে উত্তপ্ত লোহার রড় ঢুকে গিয়ে তার ইয়ত্তা নেই।

১৫৩৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় লোহা গলানো হয়। ফলে যে ফার্নেসে লোহা গলানোর কাজ হয় তার বাইরে ৬০-৬৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপ থাকে। স্বাভাবিকভাবে আমরা দেখি যে, ৩৫-৩৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেখানে ৬০-৬৫ ডিগ্রি তাপমাত্রায় কী কঠিন পরিস্থিতি হয় তা অনুমান করাও কষ্টকর। একটু অসতর্ক হলেই উত্তপ্ত লোহার রড বা আগুন থেকে ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে। কত শ্রমিকের শরীর এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে উত্তপ্ত লোহার রড় ঢুকে গিয়ে তার ইয়ত্তা নেই।

রি-রোলিং সেক্টরটা প্রচলিত অন্যান্য শিল্পকারখানা থেকে একটু ভিন্নতর। কারখানার কর্মঘণ্টার ধরন, ঝুঁকি ও পরিবেশের সঙ্গে অন্য কারখানাকে মেলানো যাবে না। রি-রোলিং মিলের ম্যানুয়াল চালিত কারখানায় একজন শ্রমিক ৪৫ মিনিট কাজ করে, ১৫ মিনিট বিরতি নিয়ে ২ ঘণ্টা কাজ করে। এই কারখানাগুলোতে একজন শ্রমিক থাকে, যার কাজ হচ্ছে কিছুক্ষণ পর পর শ্রমিকদের পানি খাওয়ানো। তার পদের নাম পানিম্যান। প্রচণ্ড গরম এবং পরিশ্রমের কাজ বলে শ্রমিকরা দরদর করে ঘামতে থাকে। ঘন ঘন লবণ-চিনিমিশ্রিত পানি না খাওয়ালে তাদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। শ্রম আইনে উল্লেখ থাকলেও অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, বেশির ভাগ কারখানার শ্রমিকদের নিয়োগপত্র বা পরিচয়পত্র নেই। ৫ বছর পর পর মজুরি ঘোষণা করার আইন থাকলেও রি-রোলিং সেক্টরে ২০১১ সালের পর মজুরি কাঠামো ঘোষণা করা হয়নি। রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে ৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং শ্রম প্রতিমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেয়া হয়েছিল। ইতোমধ্যে মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। কিন্ত সেখানে এমন একজনকে শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে, যার রি-রোলিং সেক্টরের শ্রমিকদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। শ্রম আইন অনুযায়ী মজুরি বোর্ড গঠিত হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে মজুরিসংক্রান্ত প্রস্তাবনা ঘোষণা করার কথা, কিন্তু এখন পর্যন্ত গঠিত মজুরি বোর্ডের কোন বৈঠক করা হয়নি।

আমরা জানি উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শ্রমিকের শ্রমশক্তি। যত উন্নতমানের কাঁচামাল, প্রযুক্তিই ব্যবহার করা হোক না কেন, শ্রমিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শ্রম ছাড়া কোন উৎপাদন সম্ভব হয় না। শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বিক্রি করে কখনও মাসিক মজুরি, কখনও উৎপাদন হিসাবে। শ্রমশক্তি বিক্রির আর্থিক মূল্য শ্রমিক মজুরি হিসেবে গ্রহণ করে। শ্রমিকের এই মজুরি শুধু তার জীবনধারণের জন্য নয়, বরং উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়। সুস্থ ও সবল শ্রমিক যেমন কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে, তেমনি পরবর্তী প্রজন্মের দক্ষ শ্রমশক্তির জোগান তাদের মাধ্যমেই আসে। শ্রমিকরা যেমন উৎপাদনের প্রধান শক্তি, তেমনি উৎপাদিত দ্রব্যের প্রধান ভোক্তা। ফলে শ্রমিকের শোভন মজুরি, শ্রমিকের জীবনমান, ক্রয়ক্ষমতা দেশের অর্থনৈতিক গতি বৃদ্ধি করে থাকে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে একটি নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে বলে ব্যাপক প্রচার করা হচ্ছে। জিডিপি ৭ শতাংশের মত করে বাড়ছে, মাথাপিছু আয় ১৯০৯ ডলারে উন্নীত হয়েছে, এটা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। তাই রি-রোলিং মিলের শ্রমিকদের মজুরি তার উৎপাদন, জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে সংগতি রেখে নির্ধারিত হবে–এটি একটি যুক্তিসংগত প্রত্যাশা। মজুরি কোন দয়া নয়।

মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও জাতীয়ভাবে যেসব নির্দেশনা আছে তা নিম্নরূপ–

বিশ্ব মানবাধিকারের ঘোষণায় ‘প্রত্যেক কর্মীর নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষায় সক্ষম এমন ন্যায্য পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার রয়েছে।’

আইএলও কনভেনশনের ১৩১-এ বলা হয়েছে, ‘সর্বনিম্ন মজুরি অবশ্যই আইন দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিক ও তার পরিবারের প্রয়োজন, জীবনযাত্রার ব্যয়, সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা ইত্যাদিকে বিবেচনায় নিয়ে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে।’

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদে নাগরিকদের যুক্তিসংগত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার বিষয়টি রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে বলা হয়েছে।

শ্রম আইনের ১৪১ ধারায় আছে, ‘জীবনযাপনের ব্যয়, জীবনযাপনের মান, উৎপাদন খরচ, উৎপাদনশীলতা, উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য, মুদ্রাস্ফীতি, কাজের ধরন, ঝুঁকি ও মান, ব্যাবসায়িক সামর্থ্য, দেশের ও সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থা এবং অন্যান্য

প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করতে হবে ।’

আমরা মনে করি, রি-রোলিং শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো বিবেচিত হবে । রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্টের বিবেচনাসমূহ–

১। জীবনযাপন ব্যয় : একজন কর্মক্ষম মানুষ, শিশু-বৃদ্ধ, সন্তানসম্ভাবনা মা–সবার কথা বিবেচনা করে গড়ে ২৮০০ থেকে ৩০০০ কিলোক্যালরি তাপ উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে সস্তা খাদ্য গ্রহণ করতে হলে দিনে ১১০ টাকার কমে সম্ভব হয় না । তবে বিশেষ করে রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিকের ক্ষেত্রে ৪২০০ কিলোক্যালরির বেশি তাপ উৎপাদনের প্রয়োজন; যদি ধরা হয় সে ৬ ঘণ্টা কাজ করে । কারণ এই ধরনের পরিশ্রমসাধ্য কাজে প্রতি মিনিটে কমপক্ষে ৬ কিলোক্যালরি তাপ পোড়াতে হয় । এজন্য সবচেয়ে সস্তা খাবার গ্রহণ করতে গেলে তাকে দিনে ২০৭ টাকার কমে সম্ভব নয় । ৫ সদস্যের একটি পরিবারে শ্রমিক বাদে মাসে খাদ্য বাবদ খরচ ১৩২০০ টাকা এবং শ্রমিকের খাদ্য বাবদ খরচ ৬২১০ টাকা । তাহলে পরিবারের মাসিক খাদ্য বাবদ খরচ ১৩২০০+৬২১০=১৯৪১০ টাকা । জীবনযাপন ব্যয়ের ৫০ শতাংশ এবং খাদ্য ও অন্যান্য ব্যয় ৫০ শতাংশ ধরলে মাসে পরিবারের খরচ ৩৮৮২০ টাকা ।

২ । শ্রমিক কাজ করতে আসে দারিদ্র্য দূর করার জন্য । বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের মত দেশে দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠতে হলে প্রতিদিন কমপক্ষে ২ ডলার আয় করতে হয়। সেই হিসাবে মাসে ২৪ হাজার টাকার কম আয় হলে একটি পরিবার দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠতে পারবে না। মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার গর্ব করছে যে দেশ সেই দেশে উৎপাদনের প্রধান চালিকাশক্তি শ্রমিকরা দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠবে না এটা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না ।

যে কোন অবকাঠামোর অভ্যন্তরে যেমন লোহা থাকে, তেমনি উন্নয়ন ও উৎপাদনের অভ্যন্তরে আছে লোহা উৎপাদনের সাথে যুক্ত শ্রমিকদের শ্রম-ঘাম । কিন্তু এর মূল্য ও স্বীকৃতি দুটো থেকেই বঞ্চিত শ্রমিকরা । এই অন্যায় কত দিন চলতে থাকবে?

৩ । দেশের মাথাপিছু আয় ১৯০৯ ডলার । জনসংখ্যা ১৭ কোটি । কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৬ কোটি ১৪ লাখ । সেই হিসাবে প্রতি কর্মক্ষম মানুষ ২.৭৫ জন মানুষের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাহলে একজন কর্মক্ষম মানুষের গড় মাসিক আয় ৩৫০০০ টাকার বেশি হওয়া উচিত ।

৪ । সরকার ঘোষিত বেতন কাঠামো অনুযায়ী ২০১৫ সালে পে স্কেলের সর্বনিম্ন ধাপে বেতন ৮২৫০ টাকা বেসিক ধরে ১৪০০০ টাকার বেশি নির্ধারণ করা হয়েছিল । গত তিন বছরে মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যস্ফীতি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির হার বিবেচনা করলে তা ১৭৫০০ টাকার বেশি দাঁড়ায় । রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের শ্রমিকদের জন্য জাতীয় উৎপাদনশীলতা ও মজুরি কমিশন ২০১৮ সালে তাদের জন্য ঘোষিত মজুরি কাঠামোতে সর্বনিম্ন ধাপে ৮৩০০ টাকা বেসিক ধরে ২০১৫ সাল থেকে কার্যকর করার যে ঘোষণা দিয়েছে তাতে এখন তারা সর্বসাকুল্যে ১৭৮১১ টাকা মজুরি পাচ্ছে । সরকারি কর্মচারীরা কর্মজীবন শেষে গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশনসহ যেসব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে সেটা বিবেচনা করে পরাধীন আমলেও শ্রমিকদের মজুরি সরকারি কর্মচারীদের চাইতে বেশি থাকত ।

৫ । গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডি দেখিয়েছে, কাঙ্ক্ষিত পুষ্টি অর্জন করতে হলে ২০১৭ সালের বাজারদর অনুযায়ী কমপক্ষে ১৭৮৩৭ টাকা মাসিক আয় থাকতে হবে ।

৬ । আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান অক্সফাম ২০১৭ সালে গবেষণা ও জরিপ করে দেখিয়েছে, বাংলাদেশের শ্রমিকদের শোভন মজুরি হতে হলে তা ২৫২ ডলার বা ২০৬৬৪ টাকা হতে হবে ।

৭ । জাহাজ ভাঙা শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২০১৭ সালে ১৬০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে । রি-রোলিং শিল্পের শ্রমিকের ঝুঁকি ও উৎপাদনশীলতা জাহাজ ভাঙা শিল্পের চেয়ে অধিক । অতএব তাদের মজুরি বেশি হওয়াই যৌক্তিক ।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে মালিকদের সক্ষমতা বিবেচনা করে রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ২২০০০ টাকা নির্ধারণ করা দরকার ।

কিন্তু রি-রোলিং মিলের শ্রমিকরা মজুরি কম পায় বলে এক কারখানায় ডিউটি শেষ করেই ছুটে যায় আর কোথাও কাজ করতে । প্রচণ্ড পরিশ্রম, কম মজুরি, মানসিক চাপ প্রভৃতি কারণে অল্প বয়সেই কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে রি-রোলিং শ্রমিকরা । সন্তানের শিক্ষা, অসুস্থতার সময় চিকিৎসা এবং কর্মক্ষমতা হারিয়ে চাকরি অবসানের পর ভবিষ্যৎ জীবন কিভাবে কাটবে–এই দুশ্চিন্তা শ্রমিকদের সর্বক্ষণের ।

নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র না থাকায় যেমন যখন-তখন চাকরি থেকে ছাঁটাই হওয়ার আশঙ্কার মধ্যে রি-রোলিং মিলের শ্রমিকরা থাকে, তেমনি আইনসংগত পাওনা ও সুরক্ষা নিয়ে মালিকের সাথে কথা বলার ক্ষমতাও থাকে না। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের কথা কাগজে লেখা থাকলেও বাস্তবে তা নেই। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ অনুপস্থিত রি-রোলিং মিলগুলোতে ।

যে কোন অবকাঠামোর অভ্যন্তরে যেমন লোহা থাকে, তেমনি উন্নয়ন ও উৎপাদনের অভ্যন্তরে আছে লোহা উৎপাদনের সাথে যুক্ত শ্রমিকদের শ্রম-ঘাম । কিন্তু এর মূল্য ও স্বীকৃতি দুটো থেকেই বঞ্চিত শ্রমিকরা । এই অন্যায় কত দিন চলতে থাকবে? এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এগিয়ে আসা আজ সময়ের দাবি । এই বিবেচনায় আমরা নিম্নোক্ত দাবি নিয়ে আন্দোলন করছি–

১ । রি-রোলিং মিলে কর্মরত প্রতি শ্রমিকের নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র প্রদান করতে হবে ।

২ । পে স্কেল, শিপ ব্রেকিং শ্রমিকদের মজুরি এবং বাজারদরের সাথে সংগতি রেখে ন্যূনতম মজুরি ২২০০০ টাকা নির্ধারণ করতে হবে ।

৩ । রি-রোলিং মিলে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিতে হবে ।

৪ । কর্মস্থলে নিরাপত্তা, আজীবন আয়ের সমান মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ, আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মস্থলে ঝুঁকিভাতা দিতে হবে ।

৫ । শ্রমিকদের জন্য সরকার কর্তৃক রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে ।
এই আন্দোলনকে যুক্তি, ভাষা ও শক্তি দিতে হবে ।